بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ১৯ মার্চ, ২০২১ মোতাবেক ১৯ আমান, ১৪০০ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

হযরত উসমান (রা.)'র স্মৃতিচারণ চলছিল। তাঁর শাহাদত পরবর্তী ঘটনাবলী, শাহাদতের পরের দিনগুলো সম্পর্কে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)ও সংক্ষেপে লিখেছেন।

তিনি (রা.) লিখেন, এরপর মদীনা ঐসব নৈরাজ্যবাদীর দখলে চলে আসে আর সেই দিনগুলোতে তারা যে কার্যকলাপ করেছে, তা সত্যিই হতবাক করার মতো। হযরত উসমান (রা.)-কে তারা শহীদ তো করেছিল-ই, তাঁর মরদেহ দাফন করার বিষয়েও তাদের আপত্তি ছিল তাই তিন দিন পর্যন্ত তাঁকে দাফন করা সম্ভব হয় নি। অবশেষে সাহাবীদের একটি দল সাহস করে রাতের বেলা তাঁকে দাফন করেন। তাদের পথেও নৈরাজ্যবাদীরা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে, কিন্তু কেউ কেউ কঠোরভাবে তাদেরকে মোকাবিলা করার হুমকি দিলে তারা পিছপা হয়। **(ইসলাম মে এখতেলাফাত কা আগায, আনওয়ারুল উলূম, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৩৩৩)**

হযরত উসমান (রা.) সম্পর্কে মহানবী (সা.) বিভিন্ন ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যার উল্লেখ এভাবে পাওয়া যায় যে, হযরত আবু মূসা আশআরী (রা.) বর্ণনা করেন, একদা মহানবী (সা.) একটি বাগানে প্রবেশ করেন আর আমাকে বাগানের দরজায় পাহারা দেওয়ার নির্দেশ দেন। ততক্ষণে একজন এসে ভেতরে প্রবেশের অনুমতি চায়। মহানবী (সা.) বলেন, তাকে ভেতরে আসতে দাও এবং তাকে জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান কর। আমি দেখি, তিনি ছিলেন হযরত আবু বকর (রা.)। এরপর আরেকজন আসে এবং (ভেতরে প্রবেশের) অনুমতি চায়। তিনি (সা.) বলেন, তাকে আসতে দাও এবং তাকে জান্নাতের সুসংবাদ দাও। আমি দেখি, তিনি ছিলেন হযরত উমর (রা.)। এরপর আরো একজন আসেন এবং (বাগানে প্রবেশের) অনুমতি চান। তখন তিনি (সা.) কিছুক্ষণ নীরব থাকেন। অতঃপর বলেন, তাকে আসতে দাও এবং তাকে জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান কর। তবে সে একটি বড় বিপদে নিপতিত হবে। আমি দেখি, তিনি ছিলেন হযরত উসমান বিন আফফান (রা.)। **(সহীহ্ বুখারী, কিতাব ফাযায়েলু আসহাবিন নবী (সা.), বাব মানাকেবু উসমান বিন আফ্ফান,... হাদীস নং: ৩৬৯৫)**

হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) উহুদ পাহাড়ে আরোহণ করেন তখন তাঁর (সা.) সাথে ছিলেন হযরত আবু বকর (রা.), হযরত উমর (রা.) এবং হযরত উসমান (রা.)। উহুদ পাহাড় কাঁপছিল। তিনি (সা.) বলেন, হে উহুদ! স্থির হও। বর্ণনাকারী বলেন, আমার মনে হয়– তিনি (সা.) নিজের পা দ্বারা মাটিতে আঘাতও করেছিলেন। এরপর তিনি (সা.) বলেন, তোমার বুকে এক নবী, এক সিদ্দীক এবং দু'জন শহীদ অবস্থান করছেন। **(সহীহ্ বুখারী, কিতাব ফাযায়েলু আসহাবিন নবী (সা.), বাব মানাকেবু উসমান বিন আফ্ফান,... হাদীস নং: ৩৬৯৯)**

হযরত ইবনে উমর (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) এক (আসন্ন) নৈরাজ্যের উল্লেখ করে বলেন, এই ব্যক্তি সেই নৈরাজ্যের সময় নির্যাতিত অবস্থায় নিহত হবে। হযরত উসমান (রা.)'র প্রতি ইঙ্গিত করে তিনি (সা.) এ কথা বলেছিলেন। **(সুনান তিরমিযী, আবওয়াবুল মানাকেব, বাব কওলুহুম কুন্না নাকূলু আবু বকর ওয়া উমর ওয়া উসমান, হাদীস নং: ৩৭০৮)**

হযরত উসমান (রা.) যে সম্পদ রেখে গিয়েছিলেন, সে বিষয়ে হাদীসে যে উল্লেখ পাওয়া যায় তা হল, উবায়দুল্লাহ্ বিন আব্দুল্লাহ্ বিন উতবাহ্ বর্ণনা করেন, যেদিন হযরত উসমান (রা.)-কে শহীদ করা হয়েছিল, সেদিন তাঁর কোষাধ্যক্ষের কাছে তাঁর তিন কোটি পাঁচ লক্ষ দিরহাম আর দেড় লক্ষ দিনার গচ্ছিত ছিল আর সেগুলো সব লুটপাট করে নিয়ে যাওয়া হয়। এছাড়া 'রাবাযাহ্' নামক স্থানে তিনি এক হাজার উট রেখে গিয়েছিলেন। 'রাবাযাহ্' মদীনা থেকে হেজাযের পথে তিন দিনের দূরত্বে অবস্থিত একটি গ্রামের নাম। একইভাবে বারাদীস আর খায়বার ও ওয়াদিউল-কুরায় দুই লক্ষ দিনার সমপরিমাণ সদকার সম্পদ রেখে যান; যা থেকে তিনি সদকা দিতেন। **(আত্ তাবাকাতুল কুবরা লি-ইবনে সা'দ, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৪২, উসমান বিন আফ্ফান, বৈরুতের দারুল এহইয়াউত্ তারাসুল আরাবী থেকে ১৯৯৬ সালে প্রকাশিত), (ফরহঙ্গে সীরাত, পৃঃ ১৩০, করাচীর রওয়ায একাডেমি প্রকাশনা থেকে ২০০৩ সালে মুদ্রিত)**

পূর্বে এ বিষয়টিরও উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনি (রা.) বলেন, আমি এক ধনাঢ্য ব্যক্তি ছিলাম কিন্তু এখন আমার কাছে মাত্র দু'টি উট রয়েছে- যা আমি হজ্জের উদ্দেশ্যে রেখেছি। **(ইসলাম মে এখতেলাফাত কা আগায, আনওয়ারুল উলূম, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ২৯৪)**

হতে পারে এটি সেই সময়ের কথা যখন জাতীয় কোষাগারে এমন সম্পদ ছিল যা বর্ণনাকারী হযরত উসমান (রা.)'র ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলে মনে করেছেন অথবা (এগুলো) তাঁর (রা.) ব্যক্তিগত সম্পদ হলেও তিনি তখন ব্যক্তিগত কাজে এগুলো ব্যয় করতেন না, বরং সদকা ও জাতীয় প্রয়োজনেই তা খরচ করতেন। যাহোক, এটি একটি বিবরণ যা আমি শুনিয়ে দিলাম। ইতিপূর্বে তাঁর নিজের বরাতেও একটি উদ্ধৃতি বর্ণনা করা হয়েছে কোষাগারের কোষাধ্যক্ষ সম্পর্কিত, যাকে কোষাগার সুরক্ষার জন্য নিয়োজিত করা হয়েছিল– তার থেকেও এটি প্রকাশ পায় যে, তা জাতীয় সম্পদ ছিল, যার সুরক্ষার জন্য তিনি নিরাপত্তা প্রহরী নিয়োগ করেছিলেন। **(ইসলাম মে এখতেলাফাত কা আগায, আনওয়ারুল উলূম, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৩২৯)**

সাহাবীগণ হযরত উসমান (রা.)'র শাহাদতের ঘটনা সম্পর্কে যা বর্ণনা করেছেন তা হল, হযরত আলী (রা.)-কে জিজ্ঞেস করা হয়, আপনি আমাদেরকে হযরত উসমান (রা.) সম্পর্কে কিছু বলুন। হযরত আলী (রা.) বলেন, **'তিনি তো এমন মানুষ ছিলেন যিনি ঊর্ধ্বলোকেও 'যুন্নুরাইন' হিসাবে আখ্যায়িত হতেন'**। **(আল্ ইসাবাহ্ ফী তমীযিস্ সাহাবাহ্, ৪র্থ খণ্ড,পৃঃ ৩৭৮, উসমান বিন আফ্ফান, বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০০৫ সালে প্রকাশিত)**

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লার দৃষ্টিতেও তিনি **'যুন্নুরাইন'** ছিলেন। হযরত আলী (রা.) বলেন, হযরত উসমান (রা.) আমাদের মাঝে সবচেয়ে বেশি আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষাকারী ছিলেন। হযরত আয়েশা (রা.) যখন হযরত উসমান (রা.)'র শাহাদতের সংবাদ পান তখন তিনি বলেন, তারা তাঁকে হত্যা করেছে, অথচ তিনি তাদের মাঝে সবচেয়ে বেশি আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষাকারী এবং তাদের মাঝে সবচেয়ে বেশি খোদাভীরু ব্যক্তি ছিলেন। **(আল্ ইসাবাহ্ ফী তমীযিস্ সাহাবাহ্, ৪র্থ খণ্ড,পৃঃ ৩৭৮, উসমান বিন আফ্ফান, বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০০৫ সালে প্রকাশিত)**

মহানবী (সা.) তাঁর জামাতাদের ব্যাপারে যে দোয়া করেছেন, সে সম্পর্কেও একটি বর্ণনা পাওয়া যায়। **'আল-ইস্তিআব'**-এ লিখিত আছে, হযরত মুহাম্মদ (সা.) বলেন, **'আমি আমার মহা প্রতাপান্বিত প্রভু-প্রতিপালকের নিকট দোয়া করেছি যেন তিনি এমন কোন ব্যক্তিকে আগুনে প্রবেশ না করান, যে আমার জামাতা বা আমি যার জামাতা'**। **(আল্ ইস্তিয়াব ফী মা'রেফাতিস্ সাহাবাহ্, ৩য় খণ্ড,পৃঃ ১৫৬, উসমান বিন আফ্ফান, বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০০২ সালে প্রকাশিত)**

হযরত উসমান (রা.)'র পোশাক-আশাক ও অবয়ব সম্পর্কে মাহমুদ বিন লাবীদ বর্ণনা করেন যে, তিনি হযরত উসমান বিন আফ্‌ফান (রা.)-কে একটি খচ্চরের ওপর দু'টি হলুদ চাদর পরিহিত অবস্থায় দেখেন।

হাকাম বিন সাল্‌ত বর্ণনা করেন, আমার পিতা আমাকে বলেছেন, তিনি হযরত উসমান (রা.)-কে বক্তৃতারত দেখেছেন, যখন কিনা তার গায়ে কালো রংয়ের চাদর ছিল এবং তিনি মেহেদি রংয়ের কলপ লাগিয়েছিলেন। সুলায়েম বিন আবু আমের বর্ণনা করেন, তিনি হযরত উসমান বিন আফ্‌ফান (রা.)'র গায়ে একটি ইয়েমেনী চাদর দেখেন, যার মূল্য ছিল একশ' দিরহাম। মুহাম্মদ বিন উমর বর্ণনা করেন, আমি আমর বিন আবদুল্লাহ্‌, উরওয়াহ্‌ বিন খালেদ এবং আব্দুর রহমান বিন আবু যিনাদের কাছে হযরত উসমান (রা.)'র অবয়ব ইত্যাদি সম্পর্কে জানতে চাইলে তারা সবাই অভিন্ন মতামত দিতে গিয়ে বলেন, তিনি খর্বাকৃতিরও ছিলেন না, আবার খুব লম্বাও ছিলেন না। তাঁর মুখাবয়ব ছিল খুব সুন্দর, ত্বক কোমল, দাঁড়ি ঘন ও লম্বা, গায়ের রং গোধূম বর্ণ, অস্থিসন্ধি দৃঢ় এবং প্রশস্ত কাঁধ আর মাথার চুল ছিল ঘন। তিনি দাঁড়িতে কলপ লাগিয়ে হলুদ (রঙ) করতেন। ওয়াকেদ বিন আবু ইয়াসের বর্ণনা করেন, হযরত উসমান (রা.) নিজের দাঁত স্বর্ণের তার দিয়ে বাঁধিয়ে নিয়েছিলেন। মূসা বিন তালহা বর্ণনা করেন, আমি হযরত উসমান (রা.)-কে দেখেছি জুমুআর দিন তিনি যখন বাহিরে আসতেন তখন তাঁর গায়ে দু'টি হলুদ বর্ণের চাদর থাকত। এরপর তিনি (রা.) মিম্বরে উঠতেন, তারপর মুয়ায্‌যিন আযান দিত। অতঃপর মুয়ায্‌যিন যখন নীরব হতো (অর্থাৎ আযান শেষ করত), তখন তিনি একটি বাঁকা হাতলযুক্ত লাঠির ওপর ভর করে দাঁড়াতেন এবং লাঠি হাতে নিয়ে খুতবা দিতেন। তারপর তিনি মিম্বর থেকে নামতেন এবং মুয়ায্‌যিন একামত দিত। হাসান বলেন, আমি হযরত উসমান (রা.)-কে নিজ চাদরকে বালিশ বানিয়ে মসজিদে শুয়ে থাকতে বা ঘুমাতে দেখেছি। **(আত্‌ তাবাকাতুল কুবরা লি-ইবনে সা'দ, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩২-৩৪, যিকরু লেবাসি উসমান, বৈরুতের দারুল এহইয়াউত্‌ তারাসুল আরাবী থেকে ১৯৯৬ সালে প্রকাশিত),**

মূসা বিন তালহা বর্ণনা করেন, জুমুআর দিন হযরত উসমান (রা.) একটি লাঠিতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি মানুষের মাঝে সবচেয়ে বেশি সুদর্শন ছিলেন। তার গায়ে দু'টি হলুদ বর্ণের কাপড় থাকত; একটি গায়ের চাদর, অপরটি তহবন্দ বা লুঙ্গি ; এ অবস্থায় তিনি মিম্বরে উঠতেন এবং সেখানে বসতেন। **(মজমাউয্‌ যওয়ায়েদ ওয়া মামবাউল্‌ ফওয়ায়েদ, ৯ম খণ্ড, পৃঃ ৫৮, কিতাবুল মানাকেব বাব সিফাতুহু, হাদীস নংঃ ১৪৪৯৩, বৈরুতের দারুল কুতুবুল্‌ ইলমিয়্যাহ্‌ থেকে ২০০১ সালে প্রকাশিত)**

হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর একটি আংটি ছিল যার ওপর **'মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্‌'** খচিত ছিল এবং তা মহানবী (সা.) ব্যবহার করতেন। এটি সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, হযরত আনাস বিন মালিক (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) যখন রোমের বাদশাহ্‌র কাছে পত্র লিখতে চান তখন তাঁর (সা.) সমীপে নিবেদন করা হয়, পত্রটিতে যদি মোহরাঙ্কিত করা না হয় তাহলে তিনি তা পড়বেন না। তখন মহানবী (সা.) রূপার একটি আংটি তৈরি করান যাতে **'মুহাম্মাদুর্‌ রসূলুল্লাহ্‌'** খোদাই করা ছিল। বর্ণনাকারী বলেন, আমি যেন তাঁর হাতে এখনও সেই আংটির শুভ্রতা দেখতে পাচ্ছি। **(সহীহ্‌ বুখারী কিতাবুল লিবাস, বাব ইত্তাখাযুল খাতাম, হাদীস নংঃ ৫৮৭৫)** অর্থাৎ সেই স্মৃতি আমার কাছে (এখনও) এত সতেজ!

হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.)-এর জীবদ্দশায় সেই আংটিটি তাঁর (সা.) হাতেই ছিল। তাঁর (সা.) পরে হযরত আবু বকর (রা.)'র হাতে ছিল আর হযরত আবু বকর (রা.)'র পর তা হযরত উমর (রা.)'র হাতে ছিল। অতঃপর যখন হযরত উসমান

(রা.)'র যুগ এল, তখন একদা তিনি (রা.) আরীস নামক কূপের কিনারায় বসে ছিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি (রা.) আংটিটি আঙ্গুল থেকে খুলে হাতের মধ্যে নাড়াচাড়া করতে থাকেন এবং দুর্ঘটনাবশত তা কূপের মধ্যে পড়ে যায়। বর্ণনাকারী বলেন, আমরা হযরত উসমান (রা.)'র সাথে ৩ দিন পর্যন্ত সেটি খুঁজতে থাকি, এমনকি কূপের সমস্ত পানি সেচে ফেলা হয় কিন্তু সেই আংটিটি পাওয়া যায় নি।

এই আংটিটি হারিয়ে যাওয়ার পর হযরত উসমান (রা.) যে এটি খুঁজে বের করবে তাকে প্রচুর ধনসম্পদ উপহার দেয়ার ঘোষণা দেন। এ আংটিটি হারিয়ে যাওয়ায় তিনি গভীরভাবে মর্মাহত ছিলেন। তিনি (রা.) যখন সেই আংটি পাওয়ার বিষয়ে নিরাশ হয়ে যান, তখন হুবহু তেমনই রূপার একটি আংটি তৈরি করার নির্দেশ দেন। অতঃপর হুবহু তেমনই একটি আংটি বানানো হয় যাতে **'মুহাম্মাদুর্ রসূলুল্লাহ্'** খোদিত ছিল। তিনি (রা.) সেই আংটিটি আমৃত্যু পরিধান করে রেখেছিলেন আর অজ্ঞাত এক ব্যক্তি তাঁর শাহাদতের সময় সেই আংটিটি নিয়ে যায়। **(সহীহ্ বুখারী কিতাবুল লিবাস, বাব হাল ইউজআলু নাকশুল খাতামে সালাসাহ্ আসতুরি, হাদীস নংঃ ৫৮৭৯), (তারীখুত্ তাবরী, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ১১১-১১২, সুম্মা দাখালাত সানাতু সালাসীন/ যিকরুল খবর আন সাবাবি সকুতিল খাতাম..., বৈরুতের দারুল ফিক্র ২০০২ সালে প্রকাশিত)**

হযরত উসমান (রা.) **'আশারায়ে মুবাশ্বেরা'** তথা দশজন (জান্নাতের) সুসংবাদপ্রাপ্ত ব্যক্তির একজন ছিলেন। হযরত আব্দুর রহমান বিন আখনাস (রা.) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি মসজিদে থাকাকালে এক ব্যক্তি অশালীনভাবে হযরত আলী (রা.)'র নাম উচ্চারণ করে। তাই হযরত সাঈদ বিন যায়েদ (রা.) দাঁড়িয়ে বলেন, আমি মহানবী (সা.) সম্পর্কে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি তাঁকে একথা বলতে শুনেছি, দশজন জান্নাতে যাবেন। "মহানবী (সা.) স্বয়ং, হযরত আবু বকর (রা.), হযরত উমর (রা.), হযরত উসমান (রা.), হযরত আলী (রা.), হযরত তালহা (রা.), হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ (রা.), হযরত যুবায়ের বিন আওয়াম (রা.), হযরত সা'দ বিন মালেক (রা.) জান্নাতে যাবেন এবং আমি ইচ্ছা করলে দশম জনের নামও বলতে পারি। বর্ণনাকারী বলেন, তখন মানুষ জিজ্ঞেস করে, দশম ব্যক্তি কে? হযরত যায়েদ (রা.) কিছুক্ষণ নীরব থাকেন। তারা পুনরায় জিজ্ঞেস করে দশম ব্যক্তি কে? তখন তিনি বলেন, সাঈদ বিন যায়েদ, অর্থাৎ আমি নিজে"। **(সুনান আবী দাউদ, কিতাবুস্ সুন্নাহ্, বাব ফীল খুলাফা, হাদীস নংঃ ৪৬৪৯)** এটি আমি এর পূর্বেও তাঁর (রা.) প্রেক্ষাপটে একস্থানে বর্ণনা করেছি।

জান্নাতে মহানবী (সা.)-এর সাথে হযরত উসমান (রা.)'র সাহচর্য সম্পর্কে হযরত তালহা বিন উবায়দুল্লাহ্ (রা.) কর্তৃক বর্ণিত, মহানবী (সা.) বলেন, প্রত্যেক নবীর একজন করে ঘনিষ্ঠ সাথী হয়ে থাকে। জান্নাতে আমার ঘনিষ্ঠ সাথী হবেন হযরত উসমান (রা.)। **(সুনান তিরমিযী, আবওয়াবুল মানাকেব, বাব ওয়া রফীকী ফীল জান্নাহ্ উসমান, হাদীস নংঃ ৩৬৯৮)**

হযরত জাবের (রা.) বর্ণনা করেন, আমরা একবার মহানবী (সা.)-এর সাথে একটি বাড়িতে মুহাজিরদের একটি দলের সাথে অবস্থান করছিলাম যেখানে হযরত আবু বকর (রা.), উমর (রা.), উসমান (রা.), আলী (রা.), তালহা (রা.), যুবায়ের (রা.), আব্দুর রহমান বিন অওফ (রা.) এবং সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.) উপস্থিত ছিলেন। মহানবী (সা.) বলেন, প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের সমপর্যায়ের ব্যক্তির সাথে দণ্ডায়মান হও। এরপর মহানবী (সা.) হযরত উসমান (রা.)'র পাশে দাঁড়ান এবং তার সাথে কোলাকুলি করে বলেন, انت ولى فى الدنيا و ولى فى الاخرة। অর্থাৎ তুমি এই পৃথিবীতেও আমার বন্ধু এবং পরকালেও আমার বন্ধু। **(মজমাউয্ যওয়ায়েদ ওয়া মামবাউল্ ফওয়ায়েদ, ৯ম খণ্ড, পৃঃ ৬৬, কিতাবুল মানাকেব বাব মওয়ালাতুহু, হাদীস নংঃ ১৪৫২৮, বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০০১ সালে প্রকাশিত)**

হযরত উসমান (রা.)'র মুক্ত ক্রীতদাস আবু সাহলাহ্ বর্ণনা করেন, **'ইয়াওমুদ্ দ্বার'** অর্থাৎ যেদিন বিদ্রোহীরা হযরত উসমান (রা.)-কে গৃহবন্দী করে শহীদ করেছিল সেদিনের কথা, আমি হযরত উসমান (রা.)'র নিকট নিবেদন করি, হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনি এই বিদ্রোহীদের সাথে লড়াই করুন। হযরত আব্দুল্লাহ্ (রা.)-ও তাকে বলেছিলেন যে, হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনি এই নৈরাজ্যবাদীদের সাথে লড়াই করুন। হযরত উসমান (রা.) বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমি যুদ্ধ করব না। মহানবী (সা.) আমার সাথে একটি বিষয়ে ওয়াদা করেছিলেন, অতএব আমি চাই তা যেন পূর্ণ হয়। **(উসদুল গাবাহ্ ফী মা'রেফাতিস সাহাবাহ্ লি-ইবনে আসীর, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৪৮৩-৪৮৪, উসমান বিন আফ্‌ফান, বৈরুতের দারুল ফিকর্ থেকে ২০০৩ সালে প্রকাশিত)**

হযরত উসমান (রা.)'র বিরুদ্ধে বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করা, উহুদের যুদ্ধ থেকে পলায়ন এবং বয়আতে রিযওয়ানে অংশগ্রহণ না করা সম্পর্কে আপত্তি উত্থাপন করা হয়। মুনাফিকরাও তাঁর বিরুদ্ধে এই আপত্তি করেছিল। উসমান বিন মওহাব বর্ণনা করেন, মিশরীয়দের জনৈক ব্যক্তি হজ্জের উদ্দেশ্যে আসলে সে দেখে যে, কয়েকজন লোক বসে আছে। বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সে কিছু কথা বলে। সে মানুষকে জিজ্ঞেস করে, এরা কারা? তারা বলে, এরা কুরাইশী। সে জিজ্ঞেস করে, এদের মধ্যে ওই বৃদ্ধ লোকটি কে? মানুষ উত্তরে বলে, তিনি হলেন হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমর (রা.)। সে বলে, হে ইবনে উমর (রা.)! একটি বিষয়ে আমি আপনাকে জানতে চাচ্ছি, আপনি আমাকে উত্তর দিন। হযরত উসমান (রা.) উহুদের দিন পালিয়ে গিয়েছিলেন, এটি কি আপনি জানেন? তিনি উত্তরে বলেন, হ্যাঁ। এরপর সে জিজ্ঞেস করে, তিনি (রা.) বদরের যুদ্ধেও অনুপস্থিত ছিলেন, এতে অংশগ্রহণ করেন নি, এ বিষয়টি কি আপনি জানেন? তিনি বলেন, হ্যাঁ। সে জিজ্ঞেস করে, আপনি কি জানেন তিনি বয়আতে রিযওয়ানেও অনুপস্থিত ছিলেন এবং তাতে অংশগ্রহণ করেন নি? তিনি উত্তরে বলেন, হ্যাঁ। এতে সেই ব্যক্তি আশ্চর্য হয়ে বলে, **'আল্লাহু আকবার'**। হযরত ইবনে উমর (রা.) তাকে বলেন, এদিকে আস। তুমি যেহেতু আপত্তি করেছ তাই এখন আমি তোমাকে প্রকৃত ঘটনা বলছি। উহুদের যুদ্ধের দিন তিনি যে চলে গিয়েছিলেন, এ প্রসঙ্গে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন এবং তাঁর প্রতি ক্ষমাসুলভ ব্যবহার করেছিলেন। তখনকার বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিতে সর্বত্র গুজব রটে গিয়েছিল যে, কাফিররা মহানবী (সা.)-কেও শহীদ করে দিয়েছে। তখন এমন পরিস্থিতিতে সাময়িক অনিশ্চয়তা ও দুর্ভাবনার বশবর্তী হয়ে তিনি (রা.) চলে গিয়েছিলেন। আর রইল বদরের যুদ্ধে হযরত উসমান (রা.)'র অনুপস্থিত থাকার বিষয়– এর কারণ ছিল, তাঁর সহধর্মিণী তথা রসূল তনয়া অসুস্থ ছিলেন আর মহানবী (সা.) তাঁকে বলেছিলেন, তুমি তোমার স্ত্রীর কাছেই থাক, তুমি বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের ন্যায়ই প্রতিদান ও গণিমতের সম্পদ লাভ করবে। আর বয়আতে রিযওয়ানে তাঁর অনুপস্থিত থাকার যতটুকু সম্পর্ক, স্মরণ রাখবে! মক্কার উপত্যকায় যদি হযরত উসমান (রা.)'র চেয়ে বেশি সম্মানিত অন্য কেউ থাকত তাহলে হযরত উসমান (রা.)'র স্থলে মহানবী (সা.) সেই ব্যক্তিকেই কাফিরদের নিকট দূত হিসেবে প্রেরণ করতেন। মহানবী (সা.) হযরত উসমান (রা.)-কে কাফিরদের কাছে প্রেরণ করেন আর বয়আতে রিযওয়ান সে সময় সংঘটিত হয় যখন তিনি মক্কাবাসীদের কাছে গিয়ে (আটকা) পড়েছিলেন। বয়আতে রিযওয়ানের সময় মহানবী (সা.) নিজের ডান হাত দ্বারা বাম হাতের প্রতি ইশারা করে বলেছিলেন, এটি উসমানের হাত। তিনি তার বাম হাত অপর হাতে দৃঢ়ভাবে রেখে বলেন, এটি উসমানের জন্য। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা.) একথা বলার পর সেই

ব্যক্তিকে বলেন, এখন তুমি এসব কথা নিজের সাথে নিয়ে যাও আর মনে রেখো! এগুলো কোন আপত্তির বিষয় নয়, যাও। **{সহীহ্ বুখারী, কিতাব ফাযায়েলি আসহাবিন নবী (সা.), বাব মানাকেব উসমান.... হাদীস নং: ৩৬৯৮}**এটি বুখারীর রেওয়ায়েত।

মহানবী (সা.)-এর জীবদ্দশায় মসজিদ নববী সম্প্রসারণ করা হয়েছিল, এতেও হযরত উসমান (রা.) অংশগ্রহণের সুযোগ লাভ করেন। আবু মালীহ্ নিজ পিতার বরাতে বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) মদীনার মসজিদ সম্প্রসারণের জন্য একটি ভূখণ্ডের আনসারী মালিককে বলেন, এই ভূখণ্ডের বিনিময়ে তোমার জন্য জান্নাতে একটি বাড়ি থাকবে, কিন্তু সে (এটি) দিতে অস্বীকার করে। এরপর হযরত উসমান (রা.) এসে সেই ব্যক্তিকে বলেন, এই এক খণ্ড জমির জন্য আমি তোমাকে দশ হাজার দিরহাম দিচ্ছি। তিনি (রা.) তার কাছ থেকে এই জমিটি ক্রয় করে নেন। অতঃপর হযরত উসমান (রা.) মহানবী (সা.)-এর সকাশে এসে নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনি এই জমিটুকু আমার কাছ থেকে ক্রয় করে নিন যা আমি আনসারী সাহাবীর কাছ থেকে ক্রয় করেছি। তখন তিনি (সা.) উক্ত জমি হযরত উসমান (রা.)'র কাছ থেকে জান্নাতে একটি বাড়ির বিনিময়ে ক্রয় করে নেন আর হযরত উসমান (রা.)-কেও মহানবী (সা.) একই কথা বলেন যে, জান্নাতে তোমার জন্য বাড়ি থাকবে। হযরত উসমান (রা.) বলেন, আমি দশ হাজার দিরহামের বিনিময়ে তা ক্রয় করে নিয়েছি। এরপর মহানবী (সা.) ভিত্তিপ্রস্তর হিসেবে একটি ইট রাখেন। এরপর তিনি (সা.) হযরত আবু বকর (রা.)-কে ডাকেন আর তিনি (রা.)-ও একটি ইট রাখেন। অতঃপর হযরত উমর (রা.)-কে ডাকা হয় এবং তিনিও একটি ইট রাখেন। এরপর হযরত উসমান (রা.) আসেন আর তিনিও একটি ইট স্থাপন করেন। এরপর মহানবী (সা.) অবশিষ্ট লোকদের বলেন, এখন তোমরা সবাই ইট রাখ; তখন সবাই ইট রাখেন। **(মজমাউয্ যওয়ায়েদ ওয়া মামবাউল্ ফওয়ায়েদ, ৯ম খণ্ড, পৃ: ৬৫, কিতাবুল মানাকেব বাব মা আমেলা মিনাল খায়র, হাদীস নং: ১৪৫২৪, বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০০১ সালে প্রকাশিত)** (আর এভাবেই) এই (মসজিদের) যে সম্প্রসারণ হয়েছিল তার ভিত্তিপ্রস্তর রাখা হয়।

সুমামাহ্ বিন হাযন কুশায়েরী বর্ণনা করেন, আমি অবরোধের সময় উপস্থিত ছিলাম যখন হযরত উসমান (রা.) অবরুদ্ধ অবস্থায় ঘর থেকে উঁকি দিয়ে লোকদের বলেন, আমি আল্লাহ্ এবং ইসলামের কসম দিয়ে তোমাদের জিজ্ঞেস করছি, তোমরা কি জান যখন মহানবী (সা.) মদীনায় আসেন তখন **'রূমা'** নামক কূপ ব্যতীত পানীয় জলের অন্য কোন ব্যবস্থা ছিল না। মহানবী (সা.) বলেন, কে আছে যে নিজের বালতি মুসলমানদের বালতির সাথে **'রূমা'** কূপে নামানোর জন্য ক্রয় করবে? অর্থাৎ সে নিজেও পান করবে আর মুসলমানরাও এখান থেকে পান করবে আর এর বিনিময়ে জান্নাতে তার জন্য (এর চেয়ে) উত্তম প্রতিদান থাকবে। হযরত উসমান (রা.) বলেন, এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে আমি আমার অর্থে সেই কূপ ক্রয় করি আর তাতে মুসলমানদের বালতির সাথে আমার বালতিও কূপে নামাই। আর আজ তোমরা আমাকে এখান থেকে পানি পান করতে বাধা দিচ্ছ আর আমাকে সমুদ্রের পানি পান করতে বাধ্য করতে চাও! জবাবে লোকেরা বলে, আল্লাহ্‌র কসম! আপনি সঠিক বলেছেন। এরপর হযরত উসমান (রা.) বলেন, আমি তোমাদেরকে আল্লাহ্ এবং ইসলামের দোহাই দিয়ে জিজ্ঞেস করছি, তোমরা কি জান, আমি আমার অর্থ-সম্পদ ব্যয় করে 'জায়শে উসরাহ্' অর্থাৎ তাবূকের যুদ্ধের সেনাবাহিনীকে প্রস্তুত করেছিলাম। জবাবে লোকেরা বলে, আল্লাহ্‌র কসম! (ঘটনা) এমনই ছিল। এরপর তিনি (রা.) বলেন, আমি তোমাদেরকে আল্লাহ্ এবং

ইসলামের কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করছি, তোমরা কি জান, মসজিদ নববীতে যখন নামাযীদের জন্য স্থান সংকুলান হচ্ছিল না তখন মহানবী (সা.) বলেন, যে ব্যক্তি অমুক পরিবারের কাছ থেকে এই ভূমিখণ্ড ক্রয় করে মসজিদের সাথে যুক্ত করে দিবে তার জন্য জান্নাতে এর চেয়ে উত্তম প্রতিদান থাকবে। অতঃপর আমি আমার নিজস্ব অর্থ ব্যয় করে সেই ভূমিখণ্ড ক্রয় করে মসজিদের অন্তর্ভুক্ত করে দেই। অথচ এখন তোমরা আমাকে সেই মসজিদে দুই রাকা'ত নামায পড়তেও বাধা দিচ্ছ? উত্তরে তারা বলে, আল্লাহ্‌র কসম! আসলেই তাই। পুনরায় তিনি (রা.) বলেন, আমি তোমাদেরকে আল্লাহ্ এবং ইসলামের দোহাই দিয়ে জিজ্ঞেস করছি, তোমরা কি জান, মহানবী (সা.) মক্কার **'সাবীর'** নামক একটি পাহাড়ে ছিলেন এবং তাঁর (সা.) সাথে হযরত আবু বকর (রা.), হযরত উমর (রা.) এবং আমি ছিলাম। পাহাড় যখন প্রকম্পিত হয় তখন মহানবী (সা.) এতে নিজ পদাঘাত করে বলেন, হে **'সাবীর'** পাহাড়! স্থির হও, কেননা তোমার ওপর একজন নবী, একজন সিদ্দীক এবং দু'জন শহীদ দণ্ডায়মান রয়েছে। একথা শুনে তারা বলে, আল্লাহ্‌র কসম! ঠিক তাই। তিনি (রা.) বলেন, আল্লাহু আকবর; কা'বার প্রভু-প্রতিপালকের কসম! তারা আমার অনুকূলে এই সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, আমি শাহাদতের মর্যাদায় ভূষিত হতে যাচ্ছি। **(সুনান নিসাঈ, কিতাবুল আহবাস, বাব ওয়াকফিল মাসাজিদ, হাদীস নং: ৩৬৩৮)**

মসজিদ নববীর পুনঃসম্প্রসারণের অধিকাংশ কাজ হযরত উসমান (রা.)'র যুগেই হয়েছিল। তাই এর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও প্রারম্ভিক অবস্থা বা সম্প্রসারণ সম্পর্কিত যে বর্ণনাই রয়েছে তা উপস্থাপন করছি। মহানবী (সা.)-এর যুগে মসজিদ নববীর সম্প্রসারণ সম্পর্কে পূর্বেই বলা হয়েছে। এ সম্পর্কে এমনও একটি নোট রয়েছে যে, ১ম হিজরী সনের রবিউল আউয়াল মাস মোতাবেক ৬২২ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসের শেষের দিকে মহানবী (সা.) স্বয়ং তাঁর পবিত্র হাতে মসজিদ নববীর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। ভিত্তি প্রায় তিন হাত বা দেড় মিটার গভীর ছিল। ভিত্তির জন্য পাথর দ্বারা তৈরি ইটের দেয়াল নির্মাণ করা হয় আর প্রাচীরের ওপরের অংশ কাঁচা ইট দিয়ে তৈরি করা হয় এবং (তা) রোদে শুকানো হয়। **(আব্দুল হামীদ কাদরী রচিত জসতুজূয়ে মদীনা, পৃ: ৪৩০, পাকিস্তানের ওরিয়েন্টাল প্রকাশনা থেকে ২০০৭ সালে মুদ্রিত)**

মসজিদ নির্মাণের ইতিহাস বর্ণনার সাথে সাথে মসজিদ সম্প্রসারণের ইতিহাসও এসে যাবে। মসজিদের প্রাচীর প্রায় পৌনে এক মিটার অর্থাৎ প্রায় দুই-আড়াই ফুট প্রশস্ত ছিল এবং এর উচ্চতা ছিল প্রায় সাত হাত বা সাড়ে তিন মিটার। **(আব্দুল হামীদ কাদরী রচিত জসতুজূয়ে মদীনা, পৃ: ৪৩২, পাকিস্তানের ওরিয়েন্টাল প্রকাশনা থেকে ২০০৭ সালে মুদ্রিত)**

মসজিদ নববীর নির্মাণ কাজ ১ম হিজরী সনের শওয়াল মাস মোতাবেক ৬২৩ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে সম্পন্ন হয়। **(আব্দুল হামীদ কাদরী রচিত জসতুজূয়ে মদীনা, পৃ: ৪৩৫, পাকিস্তানের ওরিয়েন্টাল প্রকাশনা থেকে ২০০৭ সালে মুদ্রিত)**

হযরত খারেজাহ্ বিন যায়েদ বিন সাবেত (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) তাঁর মসজিদের দৈর্ঘ্য ৭০ হাত বা প্রায় ৩৫ মিটার এবং প্রস্থ ৬০ হাত বা প্রায় ৩০ মিটার রেখেছিলেন। **(আব্দুল হামীদ কাদরী রচিত জসতুজূয়ে মদীনা, পৃ: ৪৩৭-৪৩৮, পাকিস্তানের ওরিয়েন্টাল প্রকাশনা থেকে ২০০৭ সালে মুদ্রিত)**

মহানবী (সা.)-এর যুগে ৭ম হিজরী সনের মহর্‌রম মাস মোতাবেক ৬২৮ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে মসজিদ নববীর প্রথম সম্প্রসারণ কাজ হয়। মহানবী (সা.) যখন খায়বারের সফল অভিযানের পর ফিরে আসেন, তখন তিনি (সা.) মসজিদ নববীর সম্প্রসারণ ও পুনঃনির্মাণের আদেশ দেন। মসজিদ কিবলার দিকে বা দক্ষিণ ও পূর্ব দিকে সম্প্রসারণ করা হয়নি, বরং

বেশিরভাগ সম্প্রসারণ কাজ করা হয়েছিল উত্তর দিকে আর কিছুটা পশ্চিম দিকেও (বর্ধিত করা হয়েছিল)। উত্তর দিকে সাহাবীদের কিছু বাড়িঘর ছিল। এই দিকে জনৈক আনসারী সাহাবীরও বাড়ি ছিল যার নিজের বাড়ি ছেড়ে দিতে কিছুটা দ্বিধা ছিল। যেমনটি পূর্বেও বর্ণনা করা হয়েছে, এমতাবস্থায় হযরত উসমান বিন আফ্ফান (রা.) নিজের পকেট থেকে দশ হাজার দিনার মূল্য দিয়ে সেই বাড়িটি ক্রয় করেন এবং মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থাপন করেন। এভাবে মসজিদ নববীর বেশির ভাগ সম্প্রসারণ উত্তর দিকে ও পশ্চিম দিকে করা সম্ভব হয়। এই সম্প্রসারণের পর মসজিদের মোট আয়তন উভয়দিকে ১০০x১০০ হাত করে অর্থাৎ, ৫০মিটার দৈর্ঘ্য ও ৫০মিটার প্রস্থ বিশিষ্ট হয়ে যায়। **(আব্দুল হামীদ কাদরী রচিত জসতুজূয়ে মদীনা, পৃঃ ৪৪৬-৪৪৭, পাকিস্তানের ওরিয়েন্টাল প্রকাশনা থেকে ২০০৭ সালে মুদ্রিত)**

হযরত উমর (রা.)'র যুগে, ১৭ হিজরী সনে মসজিদ নববী দ্বিতীয়বার সম্প্রসারণ করা হয়। হযরত আবদুল্লাহ্ বিন উমর (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.)-এর যুগে মসজিদের কাঁচা ইট দ্বারা নির্মিত হয়েছিল আর ছাদ ছিল খেজুরের ডাল ও পাতা দ্বারা তৈরি। খেজুর গাছের কাণ্ড খুঁটি হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছিল। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) মসজিদ পূর্বাবস্থায়ই থাকতে দেন এবং এতে কোন পরিবর্তন বা সম্প্রসারণ করেন নি। হযরত উমর (রা.) মসজিদের পুনঃনির্মাণ এবং সম্প্রসারণ করিয়েছেন, কিন্তু এর আকৃতি ও নির্মাণ-শৈলীতে কোন প্রকার পরিবর্তন করেন নি। (অর্থাৎ) যেভাবে ছিল, পুরোনো অংশকে সেভাবেই এবং সেই ভিত্তিমূলেই রেখে দিয়েছেন। তিনিও ঠিক সেই স্থাপত্যকলায় নির্মাণ করেছিলেন, শুধুমাত্র সম্প্রসারণ করা হয়। ছাদ আগের মতোই খেজুর পাতারই থেকে যায়। তিনি শুধুমাত্র কাঠের খুঁটি লাগিয়েছিলেন। হযরত উমর (রা.) ১৭ হিজরী সনে নিজ তত্ত্বাবধানে মসজিদ পুনঃনির্মাণের কাজ সম্পন্ন করান। এই সম্প্রসারণের পর মসজিদ নববীর মোট আয়তন (৫০x৫০) মিটার তথা ২৫০০ বর্গমিটার থেকে বেড়ে (৭০x৬০) মিটার তথা (৪২০০ বর্গমিটার বা) দৈর্ঘ্যে ১৪০ হাত ও প্রস্থে ১২০ হাত হয়ে যায়। এই বর্ণনা থেকে প্রমাণিত হয়, হযরত আবু বকর (রা.)'র যুগেও মসজিদ নববী মহানবী (সা.)-এর যুগের অনুরূপই থাকে। যদিও হযরত উমর (রা.)'র পুনঃনির্মাণের ফলে মসজিদ যথেষ্ট সম্প্রসারিত হয়। **(আব্দুল হামীদ কাদরী রচিত জসতুজূয়ে মদীনা, পৃঃ ৪৫৯, পাকিস্তানের ওরিয়েন্টাল প্রকাশনা থেকে ২০০৭ সালে মুদ্রিত)**

এরপর হযরত উসমান (রা.)'র খিলাফতকালে মসজিদ নববীর সম্প্রসারণ ও পুনঃনির্মাণ হয়। এটি হিজরী ২৯ সালের ঘটনা। হযরত উসমান (রা.) মসজিদ নববী সম্প্রসারণ এবং পুনঃনির্মাণ করেন আর এর সৌন্দর্য-বর্ধন এবং একে সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর নির্মাণের জন্য জিপশাম পাথর ব্যবহার করেন এবং কারুকার্য করেন। হযরত উসমান (রা.) মসজিদের প্রাচীর পাথর দিয়ে নির্মাণ করান, যার ওপর কারুকার্য করা ছিল আর মসজিদ নববীতে প্রথমবারের মতো শুভ্রতার জন্য চুনকামও করা হয়েছিল। ছাদে শিশুকাঠ ব্যবহার করা হয়েছিল। হিজরী ২৪ সনে হযরত উসমান (রা.) যখন খলীফা নির্বাচিত হন তখন লোকেরা তাঁর কাছে মসজিদ নববীর সম্পসারণের জন্য আবেদন করে। তারা (মসজিদের) প্রাঙ্গন ছোট হয়ে যাওয়ার অনুযোগ করে। বিশেষভাবে জুমুআর নামাযে উপস্থিতি এত বেশি হতো যে, অধিকাংশ সময় মানুষকে মসজিদের বাহিরের অংশে নামায পড়তে হতো। এজন্য হযরত উসমান (রা.) সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করেন। সবাই এই মত প্রকাশ করেন যে, পুরোনো মসজিদ ভেঙে এর স্থলে নতুন মসজিদ নির্মাণ করা হোক। অর্থাৎ পূর্বের মসজিদ

ভেঙে নতুন করে নির্মাণ করা হোক। একদিন যোহরের নামাযের পর হযরত উসমান (রা.) মিম্বরে দাঁড়িয়ে খুতবা দেন এবং বলেন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র, আমি এ মসজিদটি ভেঙে এর স্থলে নতুন মসজিদ নির্মাণ করতে চাই আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি মহানবী (সা.)-এর পবিত্র মুখ থেকে শুনেছি– যে ব্যক্তিই মসজিদ নির্মাণ করে আল্লাহ্ তা'লা তাকে জান্নাতে একটি ঘর দান করেন। আমার পূর্বে হযরত উমর ফারুক (রা.) ছিলেন আর তাঁর হাতে মসজিদ নববীর সম্প্রসারণ ও পুনঃনির্মাণ আমার জন্য এক দৃষ্টান্ত ও উদাহরণ। (এছাড়াও) আমি বিজ্ঞ সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করেছি আর তাদের সর্বসম্মত মত হল, মসজিদ নববীকে ভেঙে সেটিকে পুনরায় নির্মাণ করা উচিত।

হযরত উসমান (রা.) নতুনভাবে মসজিদ নির্মাণের পরিকল্পনা উত্থাপন করলে কয়েকজন সাহাবী এ বিষয়ে তাদের আপত্তি উত্থাপন করেন। তাদের অভিমত ছিল, মসজিদ ভাঙা উচিত হবে না। তাদের মাঝে সেসব সাহাবীও ছিলেন যাদের বসতি মসজিদ নববীর একান্ত নিকটবর্তী ছিল এবং যাদের ঘরবাড়ি এই পরিকল্পনার আওতায় ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। সাধারণ জনতার অধিকাংশই এই পরিকল্পনা সমর্থন করে, কিন্তু গুটিকতক সাহাবী আপত্তি করেন। হযরত আফলাহ্ বিন হামীদ (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত উসমান (রা.) যখন মিম্বরে দাঁড়িয়ে মানুষের মতামত জানতে চান তখন মারওয়ান বিন হাকাম বলেন, নিঃসন্দেহে এটি একটি মহৎ কাজ, কাজেই আপনি কেন মানুষের মতামত যাচাই করতে যাবেন? এ প্রেক্ষিতে হযরত উসমান (রা.) তাকে ভর্ৎসনা করেন এবং তিরস্কার করে বলেন, তোমার মঙ্গল হোক! কোন বিষয়েই আমি মানুষের ওপর জোরজবদস্তি করার পক্ষপাতী নই। অতএব আমি অবশ্যই তাদের সাথে পরামর্শ করব। তিনি (রা.) বলেন, আমি আমার মতামত মানুষের ওপর চাপিয়ে দিতে চাই না। আমি যে কাজই করব তা তাদের সম্মতি নিয়ে করব। এরপর তিনি (রা.) যখন তাঁর পরিকল্পনার পক্ষে বিজ্ঞ সাহাবীদের আস্থা লাভে সক্ষম হন তখন তিনি মসজিদ নববীর উত্তর দিকে অবস্থিত বাড়িঘর ক্রয় করে সেই জমিগুলো অধিগ্রহণ করেন। যদিও তিনি বিনিময়স্বরূপ সেই সাহাবীদের যথেষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদান করেছিলেন, কিন্তু তথাপি গুটিকতক সাহাবী তাদের বাড়িঘর দিতে রাজি ছিলেন না আর প্রায় চার বছর অতিবাহিত হয়ে গেলেও কাঙ্ক্ষিত কোন সাফল্য আসেনি। হযরত উবায়দুল্লাহ্ খওলানী (রা.)'র কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, মানুষ যখন তাদের বাড়িঘর দিতে ইতস্তত করছিল এবং যুক্তিপ্রমাণ দীর্ঘায়িত হচ্ছিল তখন আমি হযরত উসমান (রা.)-কে বলতে শুনেছি, তোমরা অনেক কথা বলে ফেলেছ। আমি মহানবী (সা.)-কে বলতে শুনেছিলাম, আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির জন্য যে-ই মসজিদ নির্মাণ করবে প্রতিদানে আল্লাহ্ তার জন্য জান্নাতে তেমনই প্রাসাদ নির্মাণ করবেন।

অনুরূপভাবে হযরত মাহমুদ বিন লাবীদ (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, হযরত উসমান (রা.) যখন মসজিদ নববী পুনঃনির্মাণের ইচ্ছা ব্যক্ত করেন, তখন মানুষের কাছে তাঁর পরিকল্পনা গ্রহণযোগ্য মনে হয় নি আর মসজিদ নববীকে তারা সে অবস্থায়ই রাখতে জোর দিচ্ছিল– যেমনটি মহানবী (সা.)-এর যুগে ছিল। এ প্রেক্ষিতে তিনি (রা.) বলেন, যে-ই আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির খাতিরে মসজিদ নির্মাণ করবে প্রতিদানে আল্লাহ্ তা'লা তার জন্য জান্নাতে অনুরূপ প্রাসাদ নির্মাণ করাবেন। মানুষকে বুঝাতে সক্ষম হওয়ার পর হযরত উসমান (রা.) ২৯ হিজরী সনের রবিউল আওয়াল মোতাবেক ৬৪৯ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে কাজ আরম্ভ করান। নতুন (মসজিদ) নির্মাণের ক্ষেত্রে কেবল ১০ মাস সময় ব্যয় হয় আর এভাবে

৩০ হিজরী সনের পহেলা মহর্‌রম মসজিদ নববীর নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়। তিনি (রা.) স্বয়ং কাজের তদারকি করতেন। (তিনি) সর্বদা দিনের বেলা রোযা রাখতেন এবং রাতের বেলা ঘুমের কারণে বাধ্য হলে মসজিদে নববীতেই বিশ্রাম করতেন। হযরত আব্দুর রহমান বিন সাফীনাহ্ (রা.) কর্তৃক বর্ণিত আছে যে, আমি দেখেছি মসজিদ নির্মাণের জন্য চুনসুর্কি হযরত উসমান গণী (রা.)-এর নিকট আনা হতো। এছাড়া আমি এটিও দেখেছি, তিনি সর্বদা নিজে দাঁড়িয়ে থেকে মিস্ত্রীদের দিয়ে কাজ করাতেন আর নামাযের সময় হলে তাদের সাথে নামায পড়তেন এবং কখনো কখনো সেখানেই ঘুমিয়ে পড়তেন। হযরত উসমান (রা.) মসজিদ নববীকে দক্ষিণে কিবলার দিকে সম্প্রসারিত করেন এবং এর কিবলার দেয়াল সেই জায়গা পর্যন্ত সম্প্রসারিত করেন যেখানে তা আজও বিদ্যমান। উত্তর দিকে ৫০ হাত তথা প্রায় ২৫ মিটার বর্ধিত করা হয় এবং পশ্চিম দিকেও কিছুটা সম্প্রসারণ করা হয়। অবশ্য পূর্ব দিকে যেখানে বরকতময় ঘরগুলো ছিল, সেদিকে কোন সম্প্রসারণ করা হয় নি। এরপর মসজিদ নববীর মোট আয়তন ২৪০০০ বর্গহাত, অর্থাৎ প্রায় ৬০০০ বর্গমিটারে দাঁড়ায়।

হযরত উসমান (রা.)'র যুগে মসজিদের দরজার সংখ্যা ছিল ৬টি। প্রথমবার মসজিদে নববীতে পাথর খোদাই করে তাতে কারুকার্য করা হয় এবং এর চুনকাম করানো হয়। হযরত খারেজাহ্ বিন যায়েদ (রা.)'র বর্ণনা অনুসারে হযরত উসমান (রা.) মসজিদে নববীর পূর্ব ও পশ্চিম দিকের দেয়ালে ছোট জানালা রাখার ব্যবস্থা করিয়েছিলেন। মসজিদে নববীর সম্প্রসারণের জন্য হযরত উসমান (রা.)-কে যেসব বাড়িঘর অধিগ্রহণ করতে হয়েছিল সেগুলোর মাঝে উম্মুল মু'মিনীন হযরত হাফসাহ্ (রা.)র হুজরা বা ঘরটিও ছিল। তাঁকে এর পরিবর্তে কিবলার দিকের দেয়াল সংলগ্ন দক্ষিণ-পূর্ব কোণের একটি ঘর দেয়া হয়েছিল এবং একটি ছোট দরজার মাধ্যমে তার ঘরে আসা-যাওয়ার ব্যবস্থা সহজ করা হয়। এছাড়া হযরত জা'ফর বিন আবু তালেব (রা.)'র উত্তরাধিকারীদের কাছ থেকে তাদের বাড়ির অর্ধাংশ এক লক্ষ দিরহামের বিনিময়ে ক্রয় করা হয় আর একইভাবে হযরত আব্বাস (রা.)'র বাড়ির কিছু অংশ ক্রয় করে মসজিদ নববীর সাথে যুক্ত করা হয়েছিল। কিবলার দিকের দেয়াল দক্ষিণ দিকে নিয়ে যাওয়া ছাড়াও মসজিদে নববীতে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য যে পরিবর্তন সাধিত হয় তা হল, নবীজীর মেহরাবের স্থান, কিবলার জায়গাও সেটির বরাবর ততদূরই এগিয়ে নিতে হয় যতদূর কিবলামুখি দেয়াল টানা হয়েছিল। এটি ঠিক সেই স্থান ছিল যেখানে বর্তমানে আমরা উসমানী মেহরাব দেখতে পাই। সেখানে প্রতীকী মেহরাবও বানানো হয়েছিল। কাদামাটির পরিবর্তে তিনি নুড়িপাথর ব্যবহার করিয়েছিলেন আর পাথর নির্মিত স্তম্ভগুলোর ভেতরে সীসার রড ব্যবহার করা হয়েছিল। এ বিষয়ের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেয়া হয়েছিল নতুন স্তম্ভগুলো যেন ঠিক সেই স্থানেই বসানো হয় যেখানে মহানবী (সা.)-এর পবিত্র যুগে খেজুরগাছের স্তম্ভগুলো ছিল।

নির্মাণকাজে যেসব উপকরণ এবং যেরূপ স্থাপত্যশৈলীর নিদর্শন ছিল তা ঠিক তেমনই ছিল যেমনটি জেরুযালেমের বিখ্যাত **'সাখরা গম্বুজ'** নির্মাণে রোমানরা ব্যবহার করেছিল। শিশু কাঠ দিয়ে ছাদ বানানো হয়েছিল, যা সীসার রড দেয়া পাথরের স্তম্ভের ওপর স্থাপিত কড়িকাঠের ওপর বসানো হয়েছিল। যেহেতু হযরত উমর (রা.)'র শাহাদত নবীজীর মেহরাবে নামাযের ইমামতি করার সময় হয়েছিল, তাই ভবিষ্যতে যেন এমন কোন দুর্ঘটনা না ঘটে তা নিশ্চিত করার জন্য হযরত উসমান (রা.) মেহরাবের স্থানে একটি **'মাকসূরাহ্'**ও (অর্থাৎ মসজিদে মুসল্লিদের সারির সামনে ইমামের দাঁড়ানোর স্থান, যেখানে মিম্বর থাকে) নির্মাণ

করান যা মাটির ইট দিয়ে নির্মিত ছিল এবং এতে গরাদ ও ছিদ্র রাখা হয়েছিল যাতে মুক্তাদিরা নিজেদের ইমামকে দেখতে পায়। এটি প্রথম নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছিল যা মসজিদে নববীতে নির্মাণ করা হয় আর যা পরবর্তীতে দামেস্কে বনু উমাইয়ার খলীফাদের নিরাপত্তা ব্যবস্থার নিয়মিত অংশে পরিণত হয়েছিল। **(আব্দুল হামীদ কাদরী রচিত জসতুজূয়ে মদীনা, পৃঃ ৪৬৩-৪৬৫, পাকিস্তানের ওরিয়েন্টাল প্রকাশনা থেকে ২০০৭ সালে মুদ্রিত), (উর্দূ লুগাত তারীখী উসূলোঁ পার, ১৮তম খণ্ড, পৃঃ ৪৯২, মাকসূরা শব্দের অধীনে)**

অর্থাৎ দেয়াল তুলে মেহরাবকে সুরক্ষিত করা হয়েছিল, তবে মুক্তাদিরা ইমামকে দেখতে পেত। যাহোক, পরবর্তীতে বিভিন্ন যুগে মসজিদের সম্প্রসারণ হতে থাকে।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বর্ণনা করেন, **"হযরত উসমান (রা.)-কে আমি হযরত সুলায়মান (আ.)-এর সাথে তুলনা করি, তাঁরও ভবন নির্মাণের খুব শখ ছিল। হযরত আলী (রা.)'র যুগে অবশ্যই আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা ছিল। একদিকে ছিলেন** মুআবিয়াহ্ **এবং অপরদিকে ছিলেন আলী (রা.) আর এই বিশৃঙ্খলার কারণে মুসলমানদের রক্তও ঝরেছিল। ৬ বছর ইসলামের (উন্নয়নমূলক) কোন কাজ হয় নি। ইসলামের জন্য উন্নয়নমূলক কার্যক্রম (যা হওয়ার তা) হযরত উসমান (রা.)'র যুগেই হয়েছে আর এরপর তো গৃহযুদ্ধই বেধে যায়।"** **(মলফূযাত, ৮ম খন্ড, পৃঃ ২৭৮)**

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, "মসজিদ কারুকার্যখচিত ও পাকা অট্টালিকাই হতে হবে তা আবশ্যক নয়, বরং কেবল জমি ঘিরে নেয়া প্রয়োজন এবং সেখানে মসজিদের সীমানা নির্ধারণ করে দেয়া উচিত আর বাঁশ বা তদ্রুপ ছাউনি জাতীয় কিছু দিয়ে দাও যেন (রোদ) বৃষ্টি থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। খোদা তা'লা কৃত্রিমতা পছন্দ করেন না। মহানবী (সা.)-এর মসজিদ কয়েকটি খেজুরের ডাল দ্বারা নির্মিত ছিল আর সে ধারাই অব্যাহত থাকে। পরবর্তীতে হযরত উসমান (রা.)'র যেহেতু অট্টালিকা নির্মাণের আগ্রহ ছিল, তাই তাঁর যুগে (তিনি) এটিকে পাকা করিয়েছিলেন। আমি মনে করি, ছন্দের দিক থেকে হযরত সুলায়মান (আ.) ও হযরত উসমান (রা.)'র নামের মিল আছে, হয়ত এই সামঞ্জস্যের কারণেই এসব কাজে তাঁর আগ্রহ বা শখ ছিল।" **(মলফূযাত, ৭ম খন্ড, পৃঃ ১১৯)**

২৬ হিজরী সনে মসজিদুল হারাম বা কাবা শরীফের সম্প্রসারণ হয়। ২৬ হিজরী সনে হযরত উসমান (রা.) হারামের সীমানা নতুনভাবে নির্ধারণ বা চিহ্নিত করেন এবং মসজিদুল হারাম তথা কাবা গৃহের সম্প্রসারণ করেন আর আশপাশের বাড়িঘর ক্রয় করে মসজিদুল হারামের সীমানাভুক্ত করেন। কেউ কেউ স্বেচ্ছায় তাদের বাড়িঘর বিক্রি করে দেয়, কিন্তু কিছু লোক নিজেদের বাড়িঘর বিক্রি করতে সম্মত হয় নি। হযরত উসমান (রা.) তাদের সম্মত করাতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেন, কিন্তু তারা তাদের সিদ্ধান্তে অটল থাকে। পরিশেষে হযরত উসমান (রা.)'র নির্দেশে সেসব বাড়িঘর ভেঙে ফেলা হয় এবং সেগুলোর মূল্য তিনি বায়তুল মালে জমা করিয়ে দেন। এতে তারা হযরত উসমান (রা.)'র বিরুদ্ধে হৈচৈ আরম্ভ করলে তিনি তাদেরকে গ্রেফতার করে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন। অতঃপর তাদেরকে সম্বোধন করে তিনি (রা.) বলেন, তোমরা আমার বিরুদ্ধে কেন এই দুঃসাহস দেখাচ্ছ তা কি তোমরা জান? এই দুঃসাহসিকতার একমাত্র কারণ হল, আমার নম্রতা। হযরত উমর (রা.)ও তোমাদের সাথে এমনই আচরণ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে তোমরা কোন টুঁ শব্দটিও করো নি। এরপর আব্দুল্লাহ্ বিন খালেদ বিন উসায়েদ হযরত উসমান (রা.)'র সাথে এই বিশৃঙ্খলাকারী লোকদের সম্পর্কে কথা বলেন, এরপর তাদের ছেড়ে দেয়া হয়। **(তারীখুত্ তাবরী, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৯২, সুম্মা দাখালাত সানাত সিত্তিও ওয়া আশারীন, বৈরুতের দারুল্ ফিক্‌র থেকে ২০০২ সালে প্রকাশিত)**

সর্বপ্রথম ইসলামী নৌবাহিনীর জাহাজ বা নৌবহরও ২৮ হিজরী সনে হযরত উসমান (রা.)'র যুগে গঠন করা হয়। আমীর মুআবিয়াহ্ বিন আবু সুফিয়ান প্রথম সেই ব্যক্তি ছিলেন যিনি হযরত উসমান (রা.)'র খিলাফতকালে সামুদ্রিক যুদ্ধ করেন। আমীর মুআবিয়াহ্ হযরত উমর (রা.)'র কাছেও সামুদ্রিক যুদ্ধের অনুমতি চেয়েছিলেন, কিন্তু তিনি অনুমতি দেন নি। পরবর্তীতে হযরত উসমান (রা.) খলীফা নির্বাচিত হলে আমীর মুআবিয়াহ্ তাঁর কাছেও (এ বিষয়ে) বার বার উল্লেখ করেন এবং অনুমতি প্রার্থনা করেন। অবশেষে হযরত উসমান (রা.) অনুমতি প্রদান করেন এবং বলেন, তুমি নিজে লোকদের বা সৈন্য নির্বাচন করবে না আর তাদের মধ্যে লটারিও করবে না, বরং তাদেরকে (এতে যোগদান করা বা না করার বিষয়ে) অধিকার দিবে। যে স্বেচ্ছায় এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে চায় তাকে সাথে নিয়ে যাও এবং তাকে সাহায্য কর। অতঃপর আমীর মুআবিয়াহ্ এমনটিই করেন। তিনি আব্দুল্লাহ্ বিন কায়েস জাসী (রা.)-কে নৌপ্রধান নিযুক্ত করেন। তিনি গ্রীষ্মকালে ও শীতকালে সমুদ্রে ৫০টি যুদ্ধ করেন আর সেসব যুদ্ধে মুসলমানদের কোন সৈনিক পানিতে ডুবে মারা যায় নি এবং কোন প্রকার ক্ষতিও হয় নি। **(তারীখুত্ তাবরী, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৯৭, সুম্মা দাখালাত সানাত সামানিও ওয়া আশারীন/ যিকরু আল্ খাবারি গযওয়া মুআবিয়াহ্ ইয়্যাহা, বৈরুতের দারুল্ ফিক্র থেকে ২০০২ সালে প্রকাশিত)**

বর্ণনায় এসেছে যে, চারিত্রিক দিক থেকে মহানবী (সা.)-এর সাথে হযরত উসমান (রা.)'র সবচেয়ে বেশি সাদৃশ্য ছিল। হযরত আব্দুর রহমান বিন উসমান (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) তাঁর মেয়ের কাছে এমন সময় আসেন যখন তিনি হযরত উসমান (রা.)'র মাথা ধুয়ে দিচ্ছিলেন। তিনি (সা.) বলেন, হে আমার কন্যা! আবু আব্দুল্লাহ্, অর্থাৎ উসমানের সাথে উত্তম ব্যবহার করবে। কেননা চারিত্রিক দিক থেকে তিনি আমার সাথে আমার সাহাবীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সাদৃশ্য রাখেন। **(মজমাউয্ যওয়ায়েদ ওয়া মামবাউল্ ফওয়ায়েদ, ৯ম খণ্ড, পৃঃ ৫৮, কিতাবুল মানাকেব বাব মা জায়া ফী খুলুকিহ, হাদীস নংঃ ১৪৫০০, বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০০১ সালে প্রকাশিত)**

হযরত ইয়াহিয়া বিন আব্দুর রহমান বিন হাতেব (রা.) বর্ণনা করেন, আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি, আমি মহানবী (সা.)-এর সাহাবীদের মধ্যে কোন বিষয়কে সবচেয়ে স্পষ্টভাবে ও সুন্দরভাবে বর্ণনা করার ক্ষেত্রে হযরত উসমান (রা.)'র চেয়ে উত্তম কাউকে দেখি নি, যদিও তিনি বেশি কথাবার্তা বলা থেকে বিরত থাকতেন। **(আত্ তাবাকাতুল কুবরা লি-ইবনে সা'দ, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩২, উসমান বিন আফ্ফান, বৈরুতের দারুল এহইয়াউত্ তারাসুল আরাবী থেকে ১৯৯৬ সালে প্রকাশিত)**

হযরত আবু হুরায়রাহ্ (রা.) বর্ণনা করেন, আমি হযরত রুকাইয়্যা বিনতে রসূলুল্লাহ্ (সা.)'র সমীপে উপস্থিত হই। সম্ভবত এখানে হযরত রুকাইয়্যা এর স্থলে হযরত উম্মে কুলসুম (রা.) হবেন। কেননা রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, বদরের যুদ্ধের সময় হযরত রুকাইয়্যা (রা.) মৃত্যুবরণ করেছিলেন আর এর ৫ বছর পর হযরত আবু হুরায়রাহ্ (রা.) মুসলমান হয়েছিলেন এবং মদীনায় এসেছিলেন। কাজেই, এখানে হযরত উম্মে কুলসুম (রা.)-কে বুঝানো হয়েছে, কেননা তাঁর মৃত্যু হয়েছিল ৯ হিজরী সনে। যাহোক রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, আমি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কন্যার সমীপে উপস্থিত হই, যিনি ছিলেন হযরত উসমান (রা.)'র স্ত্রী আর তার হাতে ছিল চিরুনি। তিনি বলেন, এইমাত্র আল্লাহ্‌র রসূল (সা.) আমার কাছ থেকে গিয়েছেন আর আমি তাঁর মাথা আঁচড়ে দিয়েছি। তিনি (সা.) আমাকে জিজ্ঞেস করেন, আবু আব্দুল্লাহ্ হযরত উসমান (রা.)-কে তুমি কীরূপ দেখ? আমি নিবেদন করি, অতি উত্তম। তিনি (সা.) বলেন, তুমিও তার সাথে সম্মানজনক ব্যবহার করবে, কেননা

তিনি আমার সাহাবীদের মাঝে চারিত্রিক দিক থেকে আমার সাথে সবচেয়ে বেশি সাদৃশ্য রাখেন। **(মজমাউয্ যওয়ায়েদ ওয়া মামবাউল্ ফওয়ায়েদ লি-আলী বিন আবু বকর, ৯ম খণ্ড, পৃঃ ৫৮, কিতাবুল মানাকেব বাব মা জায়া ফী খুলুকিহ রায়িআল্লাহ্ আনহু, হাদীস নংঃ ১৪৫০১, বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০০১ সালে প্রকাশিত)**

হযরত উসমান (রা.)'র এই স্মৃতিচারণ আপাতত এখানেই শেষ করছি। আজও আমি কয়েকজনের (গায়েবানা) জানাযা পড়াব, এখন তাদের বৃত্তান্ত তুলে ধরছি।

প্রথম জানাযা হল, আহমদ বখশ সাহেবের পুত্র মুবাশ্বের আহমদ রিঙ্গ সাহেবের, যিনি রাবওয়ার মুয়াল্লিম ওয়াক্‌ফে জাদীদ ছিলেন। তিনি গত ১০ মার্চ আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় ইহধাম ত্যাগ করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ।

তিনি ডেরা গাজী খান জেলার রিন্দা গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। মরহুম জন্মগত আহমদী ছিলেন। ১৯৯০ সনে থারপার্কার থেকে মুয়াল্লিম ওয়াক্‌ফে জাদীদ হিসেবে কাজ করতে আরম্ভ করেন। এরপর বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে মুয়াল্লিম এবং ইন্সপেক্টর হিসেবে কাজ করেছেন। যেখানেই তাকে প্রেরণ করা হয়েছে সর্বদা লাব্বায়েক বলেছেন আর কখনো কোন অজুহাত দেখান নি। সর্বদা বিশ্বস্ততার সাথে জীবন উৎসর্গকারী হিসেবে দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করেছেন। আপন-পর সবাই তার সম্পর্কে লিখেছে যে, তিনি কঠোর পরিশ্রমী, দোয়াগো, নিয়মিত তাহাজ্জুদ আদায়কারী, উত্তম দাঈ ইলাল্লাহ্, সুবক্তা, খুবই মিশুক, অতিথিপরায়ণ, প্রফুল্লচিত্ত এবং বিনয়ী মানুষ ছিলেন। সর্বদা নরম সুরে এবং মিষ্টি ভাষায় কথা বলতেন, কিন্তু জামা'তের ব্যবস্থাপনা এবং খিলাফতের বিরুদ্ধে কোন কথা শুনলে নগ্ন তরবারির রূপ ধারণ করতেন আর ততক্ষণ সেই বৈঠক থেকে উঠতেন না যতক্ষণ পর্যন্ত সেই ব্যক্তির সংশোধন না করতেন। শোকসন্তপ্ত পরিবারে তিনি স্ত্রী ছাড়া দুই পুত্র এবং তিন কন্যা রেখে গেছেন। তার ছোট ছেলে স্নেহের শাযেল আহমদ জামেয়া আহদীয়া রাবওয়ায় চতুর্থ বর্ষের ছাত্র। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের সাথে ক্ষমা ও কৃপাসুলভ আচরণ করুন।

পরবর্তী জানাযা বা স্মৃতিচারণ হল, মুনীর আহমদ ফর্‌রখ সাহেবের যিনি ইসলামাবাদ জেলার সাবেক আমীর ছিলেন। তিনি দীর্ঘ রোগ-ভোগের পর ৯ মার্চ তারিখে কানাডায় ৮৪ বছর বয়সে মৃত্যু বরণ করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ।

মরহুম এক-নবমাংশের ওসীয়্যতকারী ছিলেন। প্রকৌশলী মুনীর ফর্‌রখ সাহেবের দাদার নাম ছিল হযরত মুন্সী আহমদ বখ্‌শ সাহেব, যিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী ছিলেন। তিনি কাদিয়ানে গিয়ে ১৯০৩ সনের বার্ষিক জলসায় বয়আত করার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। তার পিতার নাম ছিল ডক্টর চৌধুরী আব্দুল আহাদ সাহেব, যিনি কৃষিবিদ্যায় এমএসসি এবং পিএইচডি করেছিলেন। সে যুগে পিএইচডি করা অনেক মেধাবী ছাত্রদের কাজ ছিল। যাহোক, তিনি পিএইচডি করেন। তিনি কিছুকাল লায়েলপুর জামা'তের আমীর হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন। ১৯৪৪ সনে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) যখন আহমদী যুবকদের, বিশেষত বিজ্ঞানীদের, ধর্মসেবার জন্য জীবন উৎসর্গ করার আহ্বান জানান তখন তিনিও, অর্থাৎ ডক্টর সাহেব বা ফর্‌রখ সাহেবের পিতাও ওয়াকফ করেন এবং সরকারি চাকরি ছেড়ে দিয়ে পরিবার-পরিজনসহ কাদিয়ানে স্থানান্তরিত হন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)'র প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ফযলে উমর রিসার্চ ইন্সটিটিউট পূর্বেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। হুযূর (রা.) তাকে ফযলে উমর রিসার্চ ইন্সটিটিউট-এর ডাইরেক্টর তথা

পরিচালক নিযুক্ত করেন। এর পাশাপাশি তা'লীমুল ইসলাম কলেজে বিজ্ঞানের শিক্ষক হিসেবেও তার নিযুক্তি হয়।

ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফর্‌রখ সাহেব ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর ডিগ্রি অর্জন করেন। এরপর প্রথম দিকে বিভিন্ন জায়গায় কাজ করার পর পাকিস্তান সরকারের অধীনে টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন বিভাগে রীতিমতো চাকরি করতে আরম্ভ করেন। চাকরিকালে তিনি দেশের বিভিন্ন শহরে কাজ করেছেন। বহু দেশে পাকিস্তান সরকারের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। ১৯৯৭ সালে পাকিস্তান টেলিকমিউনিকেশন্স লিমিটেড এর ডিরেক্টর জেনারেল পদে থাকা অবস্থায় অবসর গ্রহণ করেন। তিনি স্ত্রী, দুই পুত্র এবং দুই কন্যা রেখে গেছেন। আল্লাহ্ তা'লা তার সন্তানদেরও তার পদাঙ্ক অনুসরণের তৌফিক দান করুন।

রাওয়ালপিণ্ডিতে অবস্থানের সময় তিনি মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার জেলা কায়েদ হিসেবে সেবা করার সৌভাগ্য পেয়েছেন আর এটি ছিল ১৯৭৪ সালের সংকটময় সময়। যাহোক, তখন তিনি কাজ করার সৌভাগ্য পেয়েছেন। ১৯৭৭ সালে ইসলামাবাদ-এ স্থায়ীভাবে স্থানান্তরের পর বিভিন্ন পর্যায়ে তিনি সেবা করার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। ১৯৯০ সালে নায়েব আমীর-১ হিসেবে সেবা করার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। এরপর অবসর গ্রহণের পর তিনি জীবন উৎসর্গ করেন এবং হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.)'র সমীপে নিজেকে উপস্থাপন করলে তা গৃহীত হয়। এরপর ১৯৯৯ সালে তাকে ইসলামাবাদ শহর এবং জেলার আমীর হিসেবে দায়িত্ব দেয়া হয়। রাবওয়ায় তিনি যেসব কাজ করেছেন (তার মাঝে উল্লেখযোগ্য হল), ডাইরেক্ট ডায়ালিং সুবিধা সৃষ্টির জন্য ডিজিটাল এক্সচেঞ্জ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তিনি অনেক চেষ্টা করেছেন। এছাড়া তিনি কেন্দ্রীয় ফাইন্যান্স কমিটির সদস্য ছিলেন। IAAAE-এর কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্য ছিলেন। এছাড়া বিভিন্ন বিভাগে তিনি বিশেষ পদে এবং সাধারণভাবেও সেবা করার তৌফিক পেয়েছেন। ১৯৯৬ সালে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) ফযলে উমর ফাউন্ডেশনের পরিচালক হিসেবে তাকে নিযুক্ত করেন, যে পদে তিনি আমৃত্যু দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৮০ সালে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.)'র যুগে রাবওয়ায় সালানা জলসার সময় বিদেশী অতিথিদের জন্য জলসার বক্তৃতামালা অনুবাদের কাজ যখন আরম্ভ হয় তখন আহমদী ইঞ্জিনিয়ারদের একটি টিম গঠন করা হয়েছিল আর এক্ষেত্রেও তিনি অনেক পরিশ্রমের সাথে কাজ করেছেন এবং উল্লেখযোগ্য কাজ করার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। এই টিমের প্রধান ব্যবস্থাপক মুনীর ফর্‌রখ সাহেবই ছিলেন। ১৯৮৪ সালের এপ্রিল মাসে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) যখন ইংল্যাণ্ডে হিজরত করেছিলেন তখন এখানে যুক্তরাজ্যের বার্ষিক জলসাতেও তিনি প্রতিবছর নিয়মিতভাবে আসতেন আর অনুবাদ বিভাগের দায়িত্ব তার ওপরই অর্পণ করা হতো, অর্থাৎ মানুষের কাছে অনুবাদ পৌঁছানোর দায়িত্ব। আর তিনি খুবই সুচারুরূপে উক্ত কাজ সম্পন্ন করেন। অনেক পরিশ্রমের সাথে তিনি কাজ করতেন। তার এমারতের যুগে ইসলামাবাদেও জামা'তী নির্মাণ কাজ অনেক বেশি হয়েছে।

তার এক পুত্র বলেন, জামা'তী কাজে সন্তানদেরকে অধিকহারে অংশ নেয়ার উপদেশ দিতেন। সরকারি চাকরি করা সত্ত্বেও জামা'তের সেবায় সর্বদা অগ্রগামী থাকতেন। কর্মক্ষেত্র থেকে সোজা জামা'তের অফিসে যেতেন এবং জামা'তী দায়িত্বাবলী পালন করতেন। প্রতি বছর যুক্তরাজ্যের বার্ষিক জলসার জন্য বিশেষভাবে ছুটি বাঁচিয়ে রাখতেন। চাকরিকালে

আহমদী হবার কারণে প্রত্যন্ত এলাকা, ডেরা ইসমাইল খান-এ তাকে বদলী করা হয় আর তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ভুট্টো সাহেব বলেন, তাকে যেন পুনরায় ইসলামাবাদে কাজে না লাগানো হয়। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা কৃপা করেন এবং পুনরায় ইসলামাবাদেই তার পদায়ন হয়। আর এরপর সেখান থেকে তিনি বিভিন্ন দেশে রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধি হিসেবে যাওয়ার সৌভাগ্যও লাভ করেন। আল্লাহ্ তা'লা তার সাথে ক্ষমা ও দয়াসুলভ আচরণ করুন।

পরবর্তী জানাযা অবসরপ্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার মোহাম্মদ লতীফ সাহেবের, যিনি রাওয়ালপিণ্ডি জেলার সাবেক আমীর ছিলেন। তিনি গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ৭৭ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ।

ব্রিগেডিয়ার লতীফ সাহেব তার পিতার সাথে আনুমানিক ১৯৫৫ সালে আহমদীয়াত গ্রহণ করেছিলেন। ব্রিগেডিয়ার সাহেবের পিতা ২০০০ সালে ইন্তেকাল করেছেন। এরপর তার পরিবারে তার সন্তানরা ব্যতিরেকে ব্রিগেডিয়ার সাহেব একা-ই আহমদী ছিলেন। তিনি স্ত্রী, দু'জন পুত্র ও দু'কন্যা রেখে গেছেন। আল্লাহ্ তা'লা তার সন্তানদেরও তার পদাঙ্ক অনুসরণের তৌফিক দান করুন।

২০০০ সনে অবসর গ্রহণের পর তিনি তার পুরো সময় জামা'তের সেবায় ব্যয় করেন। (তিনি) সেক্রেটারী উমুরে আম্মা এবং রাওয়ালপিণ্ডি জেলার নায়েব আমীর ছিলেন। ২০১৯ সন থেকে ২০২১ সন পর্যন্ত আমৃত্যু তিনি রাওয়ালপিণ্ডি জেলার আমীর হিসেবে সেবা করার তৌফিক লাভ করেন। প্রায় ২০ বছর তিনি জামা'তের সেবা করার তৌফিক পেয়েছেন। মরহুম অত্যন্ত সহানুভূতিশীল, দরিদ্রদের প্রতি যত্নবান, জামা'তের সেবা করাকে খোদার কৃপা জ্ঞান করে সম্পাদন করতেন আর নিজ সন্তানদেরও এই অনুপ্রেরণাই যুগিয়েছেন। অন্তিম অসুস্থতার প্রকোপের মধ্যেও জামা'তের কাজের উদ্দেশ্যে কেন্দ্র থেকে কোন কর্মকর্তা যখনই ডাকতেন তৎক্ষণাৎ চলে যেতেন এবং নিজের অসুস্থতার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করেন নি। তিনি ক্যান্সারে আক্রান্ত ছিলেন, আর পাশাপাশি নিজের চিকিৎসাও করাচ্ছিলেন। এতদসত্ত্বেও সেবার জন্য সর্বদা উপস্থিত থাকতেন এবং কখনো **'না'** বলেন নি। আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতি ক্ষমা ও দয়াসুলভ ব্যবহার করুন।

পরবর্তী জানাযা হল, কিরগিজস্তানের আহমদী জনাব কোনকবেক উমরবেকোভ (Konokbek Omurbekov) সাহেবের। (তিনি) গত ২২ ফেব্রুয়ারি সাতষট্টি বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। কিরগিজস্তানের ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট ইলিয়াস কুবাতোভ (Ilyas Kubatov) সাহেব লিখেন, অধমের সাথে জনাব কোনকবেক সাহেবের পনেরো বছরের অধিককালের সম্পর্ক। মরহুম আহমদীয়া জামা'ত, কিরগিজস্তানের প্রাথমিক আহমদীদের একজন ছিলেন। তিনি ২০০০ সনে আহমদীয়াত গ্রহণ করেন। মরহুম অত্যন্ত নিষ্ঠাবান ও বিশ্বস্ত আহমদী ছিলেন। সর্বদা জামা'তের অনুষ্ঠানাদিতে যোগদান করতেন আর নিয়মিত জামা'তের চাঁদা এবং অন্যান্য আর্থিক কুরবানীতে অংশ নিতেন। সময়মতো নিজের ওয়াদা পরিশোধ করতেন। সময়মত পাঁচবেলার নামায পড়তেন এবং নিয়মিত তাহাজ্জুদ পড়তেন। সোভিয়েত ইউনিয়ন-এর যুগে নিজের যৌবনকালে মরহুম দেশের বিভিন্ন বড় বড় সংগঠন এবং ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের নেতৃস্থানীয় পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন আর তার বিশ্বস্ততা, সদাচার ও পরিশ্রমের কারণে সবাই তার ভূয়সী প্রশংসা করত। জীবনের শেষ বছরগুলোতে যখন কোন চাকরি-বাকরি করতেন না তখন তিনি বইপুস্তক বিক্রি করতেন, বিশেষভাবে ইসলামী বইপুস্তক বিক্রি করতেন। কিরগিজস্তানে (আহমদীয়া) জামা'তের কর্মকাণ্ডের ওপর

নিষেধাজ্ঞা আরোপের পূর্বে তিনি নিয়মিত মানুষের মাঝে জামা'তের পুস্তকাদি এবং অনূদিত কুরআন বিতরণ করতেন। তবলীগের মাধ্যমে তিনি অনেক মানুষের কাছে আহমদীয়াতের বার্তা পৌঁছিয়েছেন। মরহুম তার পেছনে স্ত্রী এবং সাত বছরের ছেলে সন্তান রেখে গেছেন। ইনি তার দ্বিতীয় স্ত্রী, প্রথম স্ত্রী'র সাথে তার বিবাহবিচ্ছেদ ঘটেছিল, তার (গর্ভে)ও সন্তানাদি আছে, সেই সন্তানরা সাবালক হলেও সম্ভবত তারা আহমদী নয়। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকেও আহমদীয়াত গ্রহণের তৌফিক দান করুন। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের প্রতি ক্ষমা ও দয়াসুলভ আচরণ করুন।

মুবাল্লিগ সাহেব লিখেন, রাশিয়ান ভাষায় পবিত্র কুরআনের অনুবাদ প্রকাশিত হলে তিনি বিভিন্ন স্থানে ভুল চিহ্নিত করেন। তখন আমি বলি, আপনি পুরো কুরআন শরীফ পড়ুন এবং যেসব স্থানে ভুল আছে তা চিহ্নিত করে দিন। তখন তিনি দশ-পনেরো দিনের মধ্যেই পুরো কুরআন শরীফের অনুবাদ পাঠ করে ভুলগুলো চিহ্নিত করে দেন। মুবাল্লিগ সাহেব আরো লিখেন, নামাযের জন্য খুবই সুন্দরভাবে ওযু করতেন আর তাকে নামায পড়তে দেখে ঈর্ষা হতো। জনাব উযগেনবায়েভ আরতুর (Uzgenbaev Artur) সাহেব বলেন, সত্য কথা হল, কোনকবেক সাহেবই আমার কাছে আহমদীয়াতের বাণী পৌঁছিয়েছিলেন। তিনি বলেন, যখনই আমি কোন প্রশ্ন করতাম তিনি আমাকে বিস্ময়কর ভঙ্গিতে উত্তর দিতেন আর তার উত্তর হতো যুক্তি, জ্ঞান ও প্রজ্ঞাপূর্ণ। জনাব কোনকবেক সাহেব অনেক উন্নত নৈতিক চরিত্রের অধিকারী, ধৈর্য ও সহনশীল মানুষ ছিলেন। তার অনুপম চরিত্র ও উন্নত বৈশিষ্ট্যের কারণেই আমি জামা'তভুক্ত হই। (হুযূর বলেন,) আমি যখন নফল রোযা রাখার ও দোয়া করার তাহরীক করি তখন থেকে তিনি (প্রতি) সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখতেন। তাকে যখন বলা হয়, সপ্তাহে একদিন রোযা রাখুন, তখন তিনি বলেন, আমি সোমবারও রোযা রাখি আর বৃহস্পতিবারও রাখি, যাতে খিলাফতের প্রত্যেক আহবানে সাড়া প্রদানকারী হতে পারি। খিলাফতের জন্য নিবেদিতপ্রাণ ছিলেন, নিয়মিত রাশিয়ান ভাষায় জুমুআর খুতবা শুনতেন। খুবই বিনয়ী ও বিনম্র মানুষ ছিলেন। অত্যন্ত প্রফুল্লচিত্তের অধিকারী ছিলেন। যেমনটি পূর্বেই বলা হয়েছে, গভীর আগ্রহের সাথে তবলীগের কাজ করতেন। আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতি ক্ষমা এবং দয়াসুলভ আচরণ করুন। (আল্লাহ্ তা'লা) সকল প্রয়াতের মর্যাদা উন্নীত করুন আর তাদের বংশধরদের মাঝেও তাদের পুণ্যকাজের ধারা বহমান রাখুন। (আমীন)

(আল্ ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ১৯ এপ্রিল, ২০২১, পৃঃ ৫-১০)
(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনুদিত)